শহীদ ড. শামসুজ্জোহা

ঊনসত্তরের আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ

সংশপ্তক হাসান

বাঙালি জাতির সংকটকালে বিভিন্ন সময় ত্রাতা হয়ে এসেছেন বিভিন্ন জন। কেউ নেতৃত্ব দিয়ে কেউ রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন অধিকার। তেমনই এক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন ড. শামসুজ্জোহা। যার রক্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভিত। নস্যাৎ করেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ তাদের সকল কূটিল উদ্দেশ্য। উত্তাল হয়েছিল ঊনসত্তরের গণআন্দোলন।

মে ১, ১৯৩৪ - ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৬৯

ড. শামসুজ্জোহার জন্ম ভারতে। তিনি ১৯৩৪ সালের ১ মে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন জোহা। বাবা মোহাম্মদ আবদুর রশীদ অল্প বেতনের চাকরি করতেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকে মেধা তালিকায় বরাবরই শীর্ষে ছিলেন জোহা। বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে তৎকালীন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় করেছিলেন স্ট্যান্ড। ১৯৫০ সালে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়। তারই জেরে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জন্মস্থান হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। নিরাপদ বাসস্থানের উদ্দেশে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশে পাড়ি জমায় শামসুজ্জোহার পরিবার।

পূর্ববাংলায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন জোহা। সেখানে বিরাজ করছিল উত্তপ্ত পরিবেশ। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল ছাত্ররা। জোহাও জড়িয়ে পড়েন এই আন্দোলনে। স্নাতক সম্পন্ন করেন জোহা। স্নাতকোত্তরে গবেষণার জন্য বেছে নেন বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে ক্রোমাইট খনিজের জারণ প্রক্রিয়া। জোহার এই গবেষণাপত্র প্রকাশ পেয়েছিল লন্ডনের এক নামকরা গবেষণা পত্রিকায়।

১৯৫৫ সালে ড. জোহা যোগ দেন পাকিস্তান অর্ডন্যান্স কারখানায় সহযোগী কারখানা পরিচালক হিসেবে। ওই বছরের শেষের দিকে রয়্যাল অর্ডিনেন্স কারখানায় বিস্ফোরক দ্রব্যের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে যুক্তরাজ্য যান তিনি। একই কারখানায় কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন তিনি। কিন্তু বিলেতের বিলাসবহুল জীবন বাঁধতে পারেনি দেশপাগল জোহাকে। ফিরে এসে যোগ দেন পশ্চিম পাকিস্তানে ওয়াহ ক্যান্টনমেন্টে সহকারী পরিচালক হিসেবে। তবে সে চাকরিতে মনোনিবেশ করতে পারেননি তিনি। ১৯৫৯ সালে সব ছেড়ে যোগ দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরুটা হয়েছিলেন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে। তবে এ পদে বেশিদিন থাকতে হয়নি। সে বছরই লেকচারার হিসেবে যোগ দেন রাবিতে। শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি।

এর কিছুদিন পর ফের স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে যান তিনি। সেখানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। চাইলে সেখানে থেকে যেতে পারতেন। কিন্তু বিলেত ধরে রাখতে পারেনি তাকে। ১৯৬৪ সালে জোহা ফিরে এসে যোগদান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই বছর পর রিডার পদে উন্নীত হন তিনি। ১৯৬৭ সালে শাহ মখদুম হলের আবাসিক শিক্ষক হন। একই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৬৮ সালে আবারও বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসে। নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি বৃত্তির সুযোগ পান। কিন্তু নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ। অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব থাকায় তিনি চাননি আরও একটি শূন্য পদ তৈরি হোক। ফিরিয়ে দেন সে সুযোগ।

ড. জোহা যখন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মগ্ন তখন দেশজুড়ে তীব্রতা পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবি। এ আন্দোলন রুখতে তৎপর হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার সহযোগী ৩৫ সেনা কমকর্তা ও সিএসপি অফিসারকে আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। শুরু হয় প্রহসনের বিচার। মামলাটি একটি ঘৃণ্য লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছিল। যে কোনোভাবে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলানোই ছিল উদ্দেশ্য। যাতে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। কিন্তু ঘৃণ্য সে উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি ছিল না বাঙালির।

এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এক হয় দেশের সচেতন জনতা। ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গন একযোগে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রসমাজ মাঠে নামে ১১ দফা কর্মসূচি দিয়ে। আন্দোলন শুরু হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ। ঐক্যবদ্ধ এ

আন্দোলন রুখতে কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে কারফিউ ভেঙে দেয়। মানুষ নেমে পড়ে রাস্তায়। হাজার বছরের বঞ্চিত বাঙালির ক্ষোভের আগুন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে।

ঢাকার রাজপথ কেঁপে ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতার স্লোগানে। কিন্তু সে আন্দোলনে নির্বিকার ছিল পাক সরকার। উল্টো ৬৯-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি আরও ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয় তারা। সেনানিবাসে আটক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে পাকিস্তানি এক সেনা সদস্য গুলি করে। ওই দিন রাত দশটার দিকে সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকার সামরিক হাসপাতালে মারা যান। এ খবর শোনামাত্রই ক্ষোভে জ্বলে ওঠে দেশ। পরদিন আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার রাজপথে। রাজশাহীতে ক্ষোভের আঁচ লাগে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। দায়িত্বে ছিলেন ড. জোহা।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুহূর্তেই পরিবেশ পাল্টে যায়। অনুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেন ড. জোহা। বিশ্ববিদ্যালয় ফুঁসে ওঠে। নিহত সার্জেন্ট হত্যার বিচার, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চেয়ে মিছিলে মিছিলে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হতে থাকে। পরদিন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি মিছিল শহর অভিমুখে যাত্রা করে। প্রথমেই হামলা চালানো হয় তদানীন্তন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ও মুসলিম লীগ নেতা আয়েন উদ্দিনের বাসায়। এরপর মিছিল সাহেব বাজার প্রদক্ষিণ শেষে পৌঁছায় রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হাইয়ের বাসভবনের সামনে। ছাত্ররা আক্রমণ চালায় অধ্যক্ষের বাসায়। কিন্তু এতে বাধা দেয় পুলিশ। অধ্যক্ষ হাইয়ের বাসভবনের সামনে এক অবাঙালি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে ছাত্রদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করা হয়। এতে মারাত্মকভাবে আহত হয় ১০-১২ জন ছাত্র। কিন্তু তাদের হাসপাতালে না পাঠিয়ে আনা হয় বোয়ালিয়া থানায়। খবরটি কানে যায় প্রক্টর জোহার। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে আসেন থানায়। আহত ছাত্রদের হাসপাতালে পাঠানোর জোর দাবি করতে থাকেন। তার দাবির মুখে বাধ্য হয়ে থানা থেকে কাভার্ড ভ্যানে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হয় ছাত্রদের।

সেদিন সাদা শার্ট গায়ে ছিল ড. জোহার। কিন্তু রঙ বদলাতে সময় লাগেনি। আহত ছাত্রদের পাঁজাকোলা করে কাভার্ড ভ্যানে তুলতে গিয়ে তাদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল শার্ট। এ ঘটনার প্রতিবাদে ওই দিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনের শহীদ মিনারের পাদদেশে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সবাই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত নিজের ওই শার্ট নিয়েই সে সভায় শামসুজ্জোহা এসেছিলেন। শার্টটি দেখিয়ে

বলেছিলেন, 'সিরাজদ্দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা দুর্নাম দেওয়া হয়েছিল। আজ অন্ধকূপ দেখে এসেছি। ছোট্ট একটা গাড়িতে ১২-১৪ রক্তাক্ত ছাত্রকে ঠাসাঠাসি করে তোলা হয়েছিল।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমার ছেলের রক্তের দাগ আমার গায়ে লেগেছে, সেজন্য আমি গর্বিত। আমিও যদি এমন রক্ত দিতে পারতাম...'। সবশেষে বজ্রকণ্ঠে জোহা ঘোষণা করেন, 'এরপর আর যদি গুলি করা হয়, কোনো ছাত্রের গায়ে লাগার আগে সে গুলি আমার বুকে লাগবে।'

এদিকে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সেদিন রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মাইকে প্রচার করা হয় ১৪৪ ধারা জারির কথা। এতে উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশের জিপে আগুন দেয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সটকে পড়ে পুলিশ। এদিকে গুজব ছড়ায় জিন্নাহ হলের ছাত্ররা জিপে আগুন দেওয়ার সময় একজন পুলিশকে ধরে নিয়ে গেছে। ফলে পরিস্থিতি রাতেই চরম মাত্রায় পৌঁছায়। পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে এসে উপস্থিত হতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় দুই হাজার জনের একটি জমায়েত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের মিছিলটি ১৪৪ ধারা ভেঙে শহর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তাদের রুখতে সম্মিলিতভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী। ছাত্রদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে সশস্ত্র অবস্থান নেয় তারা। কিন্তু এতে ছাত্ররা পিছু না হটে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। মিছিলে গুলি চালানোর প্রস্তুতি নিতে আদেশ দেন অবাঙালি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন হাদি। ছাত্রদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান ড. জোহা। তিনি ক্যাপ্টেন হাদি ও উপস্থিত ছাত্র দুই পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে দায়িত্বরত সেনা অফিসারের উদ্দেশে বলেন, 'প্লিজ ডোন্ট ফায়ার, আমার ছাত্ররা এখনই চলে যাবে ক্যাম্পাসের দিকে।' জোহা তার কথা রাখেন। কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে ছাত্রদের বুঝিয়ে শান্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পাঠাতে সক্ষম হন।

কিন্তু কথা রাখেননি ক্যাপ্টেন হাদি। ছাত্ররা হকি গ্রাউন্ডে আসতেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভেসে আসে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। গুলি ভেদ করে যায় ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক শামসুজ্জোহার বুক। বেয়োনোটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয় তাকে। ঘড়ির কাঁটায় যখন বেলা ১২টা তখন খবর এসে পৌঁছায় ড. জোহা মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন রাজশাহী পৌরসভার সামনে একটি পুলিশ ভ্যানে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ পরিদর্শকের নির্দেশে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে। এদিকে খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালের সামনে ভিড় করে ছাত্ররা। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে অপারেশন থিয়েটার পর্যন্ত গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। দুপুর দেড়টার দিকে খবর আসে জোহা আর নেই।

এদিকে জীবিত জোহার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন মৃত জোহা। তার মৃত্যুর খবর ঢাকায় পৌঁছাতেই রাজপথ কেঁপে ওঠে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের স্লোগানে। আন্দোলন এতটাই বেগবান হয় যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নমনীয় হতে বাধ্য হয়। নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয় বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীদের।

ড. জোহার এ ত্যাগের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী তিনি। ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই। তার সমাধিস্থল নামকরণ করা করা হয়েছে জোহা চত্বর। এছাড়া রাবির একটি হলের নামকরণও করা হয়েছে তার নামে। ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয় তাকে। সে বছর থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি জোহা দিবস পালন করা হয় রাবিতে। কিন্তু এটা কি যথেষ্ঠ? শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই কেন সীমাবদ্ধ থাকবে ড. জোহা দিবস? যার রক্তে ৬৯-এর গণআন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল, কেন দেশব্যাপী পালন করা হয় না তার চলে যাওয়ার দিনটি।